কিশোর সাহাবী-১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)

কিশোর সাহাবী-১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)

মূল

ইব্রাহীম মুহাম্মাদ হাসান আল জামাল মুহাম্মাদ সিদ্দীক আলমানশাবী

(বিখ্যাত আরবী সাহিত্যিক)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ্

শিক্ষক ও অনুবাদক

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক

মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

মাকতাবাতুল আশরাফ

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান) ৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

ফোনঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১১-৮৩৭৩০৮

প্রকাশকাল

মুহাররম ১৪২৪ হিজরী

মার্চ ২০০৩ ঈসায়ী

প্রচ্ছদঃ ইবনে মুমতায

গ্রাফিক্সঃ নাজমুল হায়দার

কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স

(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)

৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

ফোনঃ ৭৩৯৫২৭৪

ISBN: 984-8291-10-5

মূল্যঃ চল্লিশ টাকা মাত্র

Hazrat Abdullah ibn Abbas (R.) By Ibraheem Muhammad Hasan Al Jamal Mohammad Siddiq Almanshaby. Translated by Muhammad Fayjullah

Price Tk. 40.00 U.S. $ 01.00 only

Ebook Created by: ইসলামিক ইপাব ও মোবি ক্রিয়েটর টিম (fb group)

প্রুফ রিডঃ মাহমুদুল হাসান শাকিল

সার্বিক সহযোগিতায়ঃ জহুরুল ইসলাম

উৎসর্গ

যুগে যুগে যে সকল কিশোর ও তরুণ সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ ও অনুকরণে গৌরববোধ করেছেন। জীবনের এ মহা মূল্যবান অধ্যায়টি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য উৎসর্গ করেছেন। মিল্লাতের গৌরব সে সকল বুলন্দ নসীব কিশোর ও তরুণদের জন্য আমাদের এ সামান্য উপহার।

-অনুবাদক

কিশোর সাহাবা সিরিজের অন্যান্য বই

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ১ম খন্ড

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) ২য় খন্ড

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) ৩য় খন্ড

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) ৪র্থ খন্ড

হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযিঃ) ৫ম খন্ড

হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাযিঃ) ৬ষ্ঠ খন্ড

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) ৭ম খন্ড

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযিঃ) ৮ম খন্ড

হযরত সাঈদ ইবনুল আস (রাযিঃ) ৯ম খন্ড

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাফর (রাযিঃ) ১০ম খন্ড

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحمن

ছোট্ট বন্ধুরা!

তোমরা এতোদিন বানর আর শৃগালের চালাকির গল্প, গাধা আর কুমিরের নির্বুদ্ধিতার গল্প, আরো কত্তসব মিছেমিছি গল্প পড়ে পড়ে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সেই সব মিছে গল্পের ভীরে তোমাদের জন্য একঝাঁক কিশোর সাহাবীর জীবন কাহিনীর জোগাড় করেছেন মাকতাবাতুল আশরাফের স্বনামধন্য প্রকাশক বন্ধুবর মাওলানা হাবীবুর রহমান খান সাহেব। আশা করি কিশোর সাহাবী সিরিজের বইগুলো তোমাদের জীবন পথে আলো ঝরাবে। সেই আলোকময় পথে হেটে হেটে একদিন তোমরাও হয়ে উঠবে অনেক বড়। একেবারে মহিরূহ।

অনেক ঘাম ঝরিয়ে তোমাদের জন্য যিনি এই সুন্দর আয়োজন করলেন, আমাদের হাবীব ভাই তার জন্য তোমরা দুআ করো। খোদা যেন তাকে এমন আরো অনেক ভালো কাজ করার তাওফীক দেন, তিনি যেন তোমাদের জন্য এমন আরো অনেক সুন্দর বই উপহার দিতে পারেন। আর কৃতজ্ঞ মনে আরেকজন বন্ধু স্বনামধন্য লেখক মাওলানা যাইনুল আবিদীন সাহেবের কথা স্মরণ না করে পারি না,

যিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে এইখানে নিয়ে এলেন। তার উদ্দেশ্যে বলছি জাযাকাল্লাহু খাইরান।

আর আমিও তোমাদের কাছে দু'আ চাই। তোমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করো যেন কিশোর সাহাবী সিরিজের সবগুলো বই যত্ন সহকারে অনুবাদ করার তাওফীক তিনি আমাকে দেন।

বিনয়াবনত

মুহাম্মাদ ফয়জুল্লাহ

ই-৪৩, মুসলিমাবাদ রোড, গাজীপুর

প্রকাশকের কথা

بسم الله الرحمن الرحمن

বাংলাদেশের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব জনাব প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব, শরী'অতের অনুশাসন ও সুন্নাতে নববী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি এমন নিরংকুশ আত্মসমর্পিত জীবন-যাপন করেন, যা দেখে আমাদের শুধু ঈর্ষাই হয়। তাঁর অনুপম ও উন্নত ইসলামী আখলাক তার আশপাশের লোকদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। যার দরুন বাংলাদেশের সর্বোচ্চ কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়' এ এক ধরনের ব্যতিক্রম পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। এ প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন প্রফেসর ও কর্মকর্তা তাদের আত্মজ সন্তানদের নিজেদের শিক্ষা থেকে সযত্নে দূরে রেখে খালেস দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত- দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করেছেন। মুলতঃ এ রকম কিছু ছাত্র নিয়েই জনাব প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান ছাহেব গড়ে তুলেছেন উত্তরার মুহাম্মাদিয়া মাখযানুল উলুম মাদরাসা। সেখানে অধমও একজন খণ্ডকালীন উস্তায। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র নূরুল হুদা, আশরাফ ও রিযওয়ানুল কবীরের কাছে আরবী শিশু-সাহিত্যের সুন্দর তিনটি সিরিজ

১. শহীদানের গল্প শোন।

شهداء حول الرسول صلى الله عليه وسلم

২. কিশোর সাহাবা।

اطفال حول الرسول صلى الله عليه وسلم

৩. রাসূলের (স.) যুগের আদর্শ কিশোরী।

بنات حول الرسول صلى الله عليه وسلم

দেখতে পাই এবং এগুলোর অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেই। মূলতঃ দ্বিতীয় কিতাবটির প্রথম খণ্ড অবলম্বন করেই তৈরী হয়েছে আমাদের এবারের আয়োজন "কিশোর সাহাবা" সিরিজের প্রথম খণ্ড "হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)"।

তরুণ আলেম মাওলানা ফয়জুল্লাহ ছাহেব যত্ন করে বইটির অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ পাক তাঁকে দুনিয়া ও আখেরাতে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

আমাদের শিশু-কিশোরদের রুচি অনুযায়ী আমরা এই সুন্দর বইটিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কবুল করুন। এ বই পাঠ করে আমাদের শিশু-কিশোরদেরকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) মত আল্লাহ ও রাসূলের একান্ত অনুসারীরূপে গড়ে উঠে মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

বিনীত মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

আজিমপুর, ঢাকা।

১৮ই মুহাররম ১৪২৪ হিজরী

সূচীপত্র

মাকতাবাতুল আশরাফ -এর

শ্রেষ্ঠ কয়েকটি প্রকাশনা

তাযকিরাতুল আখেরাহ

(গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনী ভাষণ)

প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান

মূল্যঃ ২০০.০০ টাকা

আখেরাতের পাথেয়

(মাওয়ায়েযে আবরার-১)

মূলঃ মুহিউস সুন্নাহ মাওলানা আবরারুল হক ছাহেব

অনুবাদঃ মাওলানা হাসান সিদ্দিকুর রহমান

মূল্যঃ ১০০.০০ টাকা।

শ্বাশ্বত সত্যের পয়গাম

(১১টি বয়ান সংকলন)

মূলঃ মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী (রহঃ) অনুবাদ : মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ

মূল্যঃ ১০০.০০ টাকা

বেহেশতের পথ ও পাথেয়

বাংলার বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ হাফেজ্জী হুযূর (রহঃ) -এর বাণী সংকলন

মূল্যঃ ৯০.০০ টাকা

কে সে জন?

আমরা এখন যে মহান ব্যক্তির আলোচনা করতে যাচ্ছি তিনি হচ্ছেন উম্মতে মুহাম্মাদীর মহাজ্ঞানী, কুরআনের ভাষ্যকার হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু।।

তাঁর বাবা আবুল ফযল আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টিকে গোপন রাখেন, আর বদরের যুদ্ধের দিন মুশরিকদের সাথে যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। সেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা দিয়েছিলেনঃ যে ব্যক্তি আব্বাসের মুখোমুখি হবে সে যেন তাঁকে হত্যা না করে, কেননা সে স্বেচ্ছায় যুদ্ধে আসেনি। আবুল ইউছর কায়াব ইবনে আমর (রাযিঃ) তাকে বন্দী করেন। তিনি নিজের মুক্তিপণ পরিশোধ করে মক্কায় ফিরে যান।

আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)-এর মাতা হচ্ছেন উম্মুল ফযল লুবাবাহ্ বিনতে হারেছ (রাযিঃ)। তিনি হজরত খাদীজা (রাযিঃ) এর পরেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তার স্বামী হযরত আব্বাস

(রাযিঃ) এর পুর্বেই তিনি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। নারীদের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় মুসলমান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে তিনি ত্রিশটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত উসমান (রাযিঃ) এর শাসন আমলে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। হযরত আব্বাস (রাযিঃ) তখনও জীবিত।

উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমূনাহ (রাযিঃ) ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর খালাম্মা। তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা, তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সমর্পন করেন। এ ব্যাপারে এই আয়াতটি নাযিল হয়—

وامرأة مؤمنة إنوهبت نفسهاللنبي (احزاب-٥٠)

অর্থঃ কোন মুমিন নারী যদি নিজেকে নবীর কাছে সমর্পন করে। (আহযাব-৫০)

ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সর্বশেষ স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন।
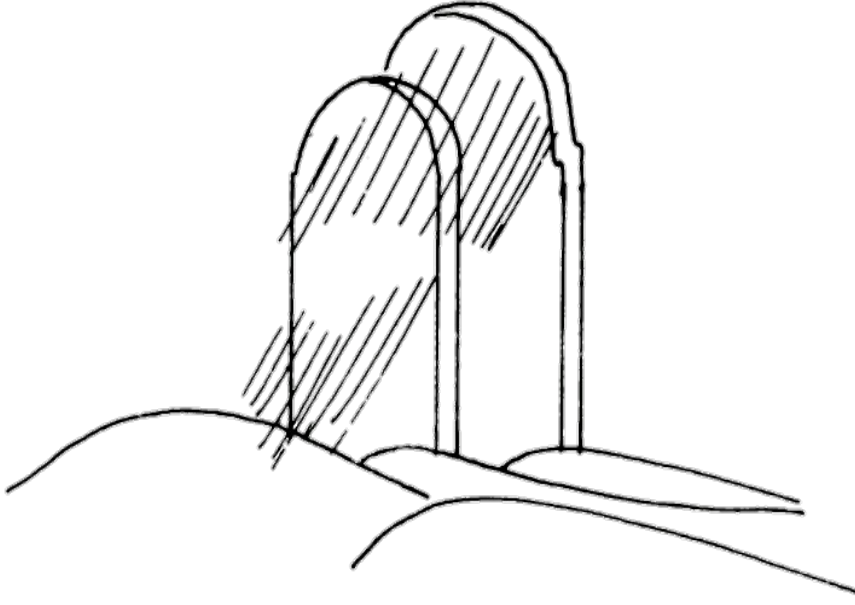
যেভাবে এলেন দুনিয়ায়

যেভাবে এলেন দুনিয়ায়
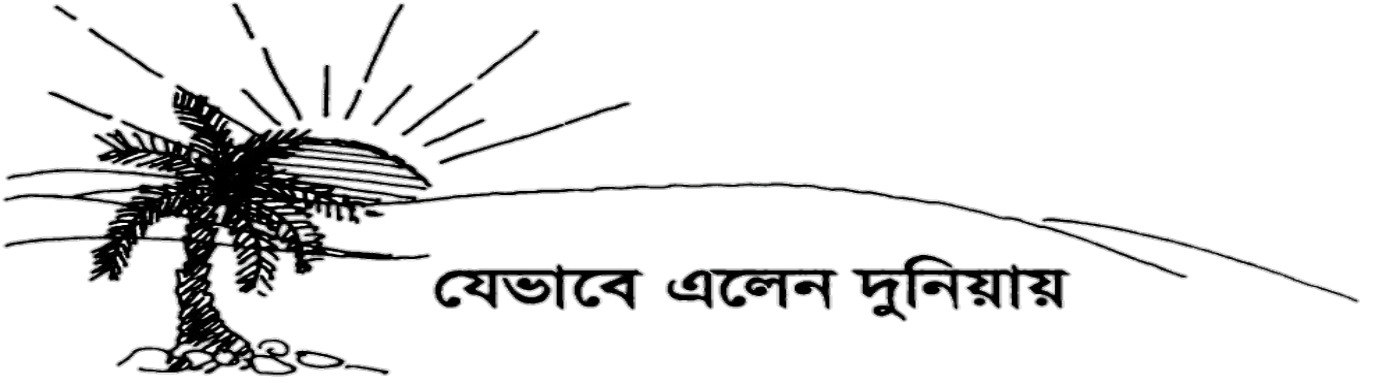
মুসলমানদের উপর মক্কার কাফেরদের নির্যাতনের মাত্রাটা বেড়েই চললো। এমনকি এক পর্যায়ে মক্কার কাফেররা একটি চুক্তি সম্পাদন করলো, সেই চুক্তিতে তারা এই ব্যাপারে একমত হলো যে, তারা মুসলমানদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেনা। মুসলমানদের প্রতি যারা সহানুভুতিশীল অথবা মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দিতে চায় অথবা ইসলামের অস্তিত্বকে যারা মেনে নিয়েছে। তাদের সকলের সাথে তারা সর্বাত্মক বয়কট করবে। তাদের কাছে কোন কিছু বেচবেও না, তাদের কাছ থেকে কোন কিছু কিনবেও না। তাদের কাছে নিজেদের মেয়ে বিয়ে দেবে না। তাদের মেয়েদের সাথে নিজেদের ছেলেদের বিয়েও করাবে না।

মুশরিকদের হাতে লেখা এই হল নামাটা যেইনা স্বাক্ষরিত হলো, সাথে সাথে কোরাইশরা বনী হাশেমের উপর অবরোধ আরোপ করে বসলো। সেখানে যারাই ছিল তাদের কাউকে বের হতে দিল না।

বাইরের কাউকে সেখানে প্রবেশও করতে দিল না।। এমনকি বাইর থেকে কাউকে তাদের সাথে যোগাযোগ পর্যন্ত করতে দিল না।।

এই শাসরুদ্ধকর পরিবেশে এসে অবস্থান নিলেন উম্মুল ফযল তার স্বামী আব্বাসের সাথে । আব্বাস (রাযিঃ) তো বনী হাশেমের লোক তাই তিনি সেখানে থাকবেন এটা ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু উম্মুল ফযল যখন বনী হাশেমের পাড়ায় প্রবেশ করেন তখন তিনি ছিলেন সন্তান সম্ভবা। গর্ভে সন্তান ধারণের অসহনীয় ধকল আর নিদারুণ কষ্ট নিয়ে কেন তিনি অবরুদ্ধ বনী হাশেম পাড়ায় এসে প্রবেশ করলেন? তিনিতো অন্য কোথাও থাকতে পারতেন। কিসের মোহ তাকে এখানে টেনে এনেছিল ? অন্য কিছু নয়, শুধু ঈমান। রাসূলের প্রতি এবং ওহীর যে অমূল্যসম্পদ রাসূল নিয়ে এসেছেন। সে সবের প্রতি তার হৃদয়ে ঈমানের যে দ্বীপ্ত শিখা জলজল করছিল সে আলোর টানেই তিনি এসেছিলেন অবরুদ্ধ হতে স্বেচ্ছায় সাগ্রহে।

আর হযরত খাদীজা (রাযিঃ) এর সাহচর্য তাকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাতো, যার ফলে তিনি ভুলে যেতেন শত কষ্ট আর যাতনার কথা। ফলে তিনি অনায়াশে পেরিয়ে যেতেন বেদনার ঐ নীল সাগর। কোন কষ্টই আর তার কাছে কষ্টের থাকেনি। সকল বেদনাই যেন তখন হয়ে উঠেছিল মধুর।

হযরত খাদীজাও কি এমন নিবেদিত প্রাণ সখীকে ভুলে যাবেন ? না কখনো নয়। তিনিও তার প্রতি নজর রাখতেন, আপ্রাণ চেষ্টা করতেন যেন শতকষ্টের মাঝেও নিজের সইকে একটু সহযোগীতা করা যায়। খাদীজার স্বজনরা কাফেরদের চোখের আড়ালে আবড়ালে যা কিছু খাদ্য দ্রব্য পাঠাতো, তা যত সামান্যই হোক না কেন তা। থেকে তিনি উম্মুল ফযলকে অবশ্যই কিছু দিতেন। না দিয়ে

কিছুই নিজের মুখে তুলতেন না। উম্মুল ফযলকে একটু আধটু দিয়ে তবেই মুখে তুলতেন, দিতেন অন্যদেরকেও।

উম্মুল ফযল যখন অন্তসত্বা হলেন তখন আব্বাস (রাযিঃ) এলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে, এসে বললেনঃ হে মুহাম্মদ! আমার মনে হয় উম্মুল ফযল সন্তান সম্ভবা! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ? হয়তো আল্লাহ্ একটি পুত্রসন্তান দিয়ে আমাদের মুখ উজ্জল করবেন।

দিন যায় মাস যায়! সন্তান প্রসবের মাসটি ঘনিয়ে আসে। নড়া চড়া আর চলাফেরা হয়ে ওঠে তার জন্য কষ্টকর। সারাদিন শুয়ে বসে সময় কাটে উম্মুল ফযলের। এমন সময় একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলেন তার বাড়িতে। চাচা আব্বাসের (রাযিঃ) বাড়িতে। মাঝে মধ্যে তিনি সেখানে গিয়ে দুপুরে বিশ্রাম নিতেন। এসে তাঁকে সালাম জানালেন, বললেন ? উম্মুল ফযল!

উম্মুল ফযল বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল আমি হাজির।

রাসূলের মুখে শুভসংবাদের বাণী। তিনি বললেনঃ আপনিতো এক পুত্রসন্তান ধারণ করেছেন! উম্মুল ফযলের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর!

তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! সেকি করে হয়!? কোরাইশরা তো চুক্তিবদ্ধ হয়েছে জোটবদ্ধ হয়ে চেষ্টা তদবীর করেছে, যেন মুসলিম মায়েরা সন্তান প্রসবও না করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কণ্ঠে পাহাড়ের দৃঢ়তা। তিনি বললেনঃ আমি যা বললাম তাই হবে ইনশাআল্লাহ্। সে যখন জন্মগ্রহণ করবে তখন আপনি ওকে নিয়ে আমার কাছে চলে আসবেন।

উম্মুল ফযলের একদিন প্রসব বেদনা শুরু হলো। তার ঘরে এলো সুসংবাদবাহী সোনার টুকরো ছেলেটি। উম্মুল ফযল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটি মুহূর্তের জন্যও ভূলে যাননি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথামতো সেই সোনার টুকরো ছেলেটিকে একটুকরো কাপড়ে মুড়িয়ে নিয়ে সোজা চলে গেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে খুশি হলেন। তার নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। নিজের মুখে খেজুর চিবিয়ে নরম করে আব্দুল্লাহর মুখে তুলে দিলেন। একেই বলে তাহনীক'। 'তাহনীক করা সুন্নাত। আজো আমরা এই সুন্নাত পালন করে থাকি। কোন আল্লাহ্ওয়ালা ব্যক্তির চিবানো খেজুর নবজাতকের মুখে পুরে দিই। এতে শিশুর জীবনে নেমে আসে বরকতের ধারা। এর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নাও ওকে নিয়ে যাও! দেখবে! বড় হয়ে সে হবে খুবই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। উম্মুল ফযল। ফিরে গেলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে দুধ পান করানোর কাজে লেগে গেলেন। ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তার লালন পালনে। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি মুসলমানদের অবস্থার খোঁজ খবর রাখতেন। বিশেষ করে হযরত খাদীজা (রাযিঃ) ও আবু তালেবের মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, তার সর্বশেষ পরিস্থিতির খবরটি তিনি বরাবরই রাখতেন। এ পর্যায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কাফেরদের নির্যাতন আরো কঠোর হলো, হলো আরো নির্মম।

হযরত আব্বাস (রাযিঃ) তখনও ইসলাম কবুল করেননি, এদিকে তার স্ত্রী উম্মুল ফযল একজন পাক্কা মুসলমান। আব্বাসের স্ত্রী হয়েও তিনি রাসূলের পক্ষে অবস্থান করছেন। আসলে আব্বাসের

হৃদয়েও ঈমানের দ্বীপ্ত শিখা জ্বলছিল মিট মিট করে, কিন্তু সমস্যা ছিল অন্যখানে। আব্বাসের বিপুল বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল মক্কার কাফেরদের সাথে। মক্কার অনেক নেতার কাছে ছিল তার বেশকিছু টাকা পয়সা। এই মুহূর্তে যদি তিনি নিজের মনের আবেগ প্রকাশ করে ফেলেন, ইসলামের জন্য দরদ দেখান, তাহলে তার এই বিপুল পরিমাণ টাকা কড়ি নির্ঘাত হাতছাড়া হয়ে যাবে, তাই তিনি মনের আবেগ মনের ভেতরে চেপে রাখলেন কিছু সময়ের জন্য।

মদীনার পথে

মদীনার পথে

হযরত আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হিজরতের অনুমতি চেয়ে মদীনায় একটি পত্র লিখলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই পত্রের উত্তরে লিখলেনঃ “চাচা! আমার নবুওয়ত যেমন আখেরী নবুওয়ত ঠিক তেমনি আপনার হিজরতও একেবারে আখেরী হিজরত।” আর হলোও তাই।

আব্বাস (রাযিঃ) পত্র পেয়ে আর কাল-বিলম্ব করলেন না। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টাকা-পয়সাগুলো সংগ্রহ করে নিলেন। হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন, তাঁর সাথে প্রস্তুত হলেন তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফযল আর তাঁর সন্তানেরা। যাদের শীর্ষে ছিলেন বালক আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। তাঁর মনে আনন্দ আর ধরে না। তিনিতো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের নূরানী মুখখানা একটিবার দেখার জন্য। পাশে বসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধুঝরা কথা শোনার জন্য।

হযরত আব্বাস (রাযিঃ) আর তাঁর পরিবারের সদস্যরা বেরিয়ে পড়লেন মক্কা থেকে মদীনার পথে। তারা যখন জোহফা নামক স্থানে এসে পৌছলেন, দূর থেকে দেখতে পেলেন এক বিশাল সৈন্য বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে মহা শান শওকতে এগিয়ে আসছেন আমাদের রাসূল, প্রাণের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি মক্কার পথে চলছেন। মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে চলছেন। হযরত আব্বাস (রাযিঃ)ও রাসূলের সাথী বনে গেলেন। এবারের মত মদীনা যাওয়া হলো না আব্বাসের । উমুল ফযল সন্তানদের নিয়ে নিজের হিজরত পূর্ণ করলেন। তারপর তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন মদীনাতেই ছিলেন।

নবুওয়তের অঙ্গনে
হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)
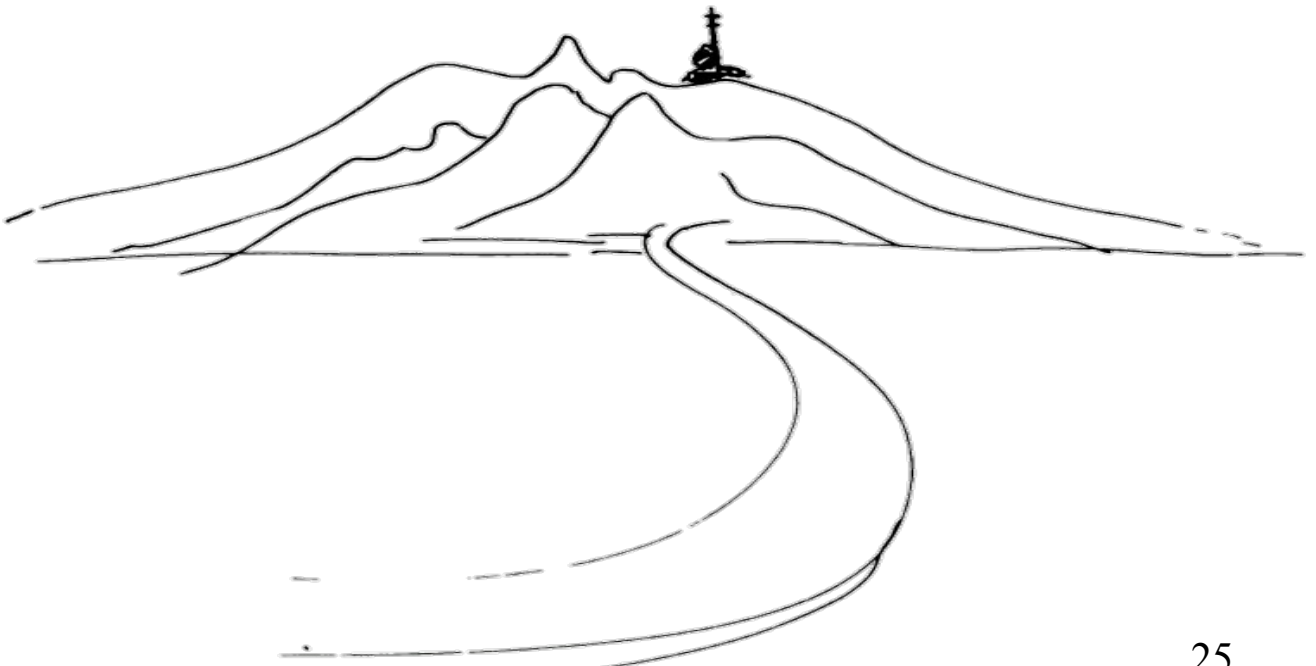
নবুওয়তের অঙ্গনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)

মায়ের আঁচল ধরে মদীনায় হিজরত করেছেন বালক আব্দুল্লাহ। এখনো তিনি তারুণ্যে পা রাখেননি। মদীনায় হিজরত করে তার মনে আনন্দ আর ধরে না। কারণ একটাই, তিনি রাসূলের কাছে কাছে থাকবেন, পাশে পাশে হাটবেন। বয়সে ছোট হলে কি হবে তিনি সে বয়সেও অর্বাচীন ছিলেন না। ভাবনার জানালা খুলে তিনি তাকিয়ে দেখলেন, মুক্তি ও সফলতার সিড়িটি লেগে আছে সেই ঘরের চৌকাঠে যেখানে ওহী নেমে আসে খোদার দরবার থেকে ক্ষণে ক্ষণে, সকাল সাঁঝে। তাই হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছায়ার মত লেগে থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যান হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসও যান সেখানে। যে পথে পা ফেলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাসও সে পথে চলেন রাসূলের পিছু পিছু। প্রজ্ঞা ও ইলমের অফুরাণ ঝর্না থেকে নিজের পানপাত্র পুরিয়ে নেওয়ার জন্য, তৃষ্ণা মিটিয়ে নেওয়ার তীব্র আশায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে অবস্থান করতেন, সাহাবীদের সাথে কথা বলতেন, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তখনই শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে থাকতেন তা নয়, বরং ঘরে বাইরে সর্বত্র তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশেই থাকতেন।

উম্মুল মুমিনীন মাইমুনাহ ছিলেন তার খালাম্মা। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তার ঘরেই নিজের প্রায় সবটুকু সময় কাটিয়ে দিতেন। খাওয়া দাওয়া করতেন সেখানে। ঘুমাতেনও সেখানেই।

একদিন বাড়ী ফিরতে রাসূলের একটু দেরী হলো, রাতের বেলা বাড়ী ফিরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন আব্দুল্লাহ তার খালাম্মার আদরের আঁচল তলে মাথা গুজে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ ছেলেটি কি নামায আদায় করেছে ?

হযরত মাইমুনাহ্ (রাযিঃ) উত্তর দিলেনঃ জি হ্যা, সে তো এশার পরের নামাযগুলোও আদায় করেছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) শুধু মনের সান্তনা আর সময় কাটানোর জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে পাশে থাকতেন তা নয়, বরং তার এই সাহচর্য ছিল শিক্ষার

মানসে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ জানার জন্য। রাসূলের কাজকর্মের খোজ খবর রাখার জন্য। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সব আমলেরই পই পই করে খোজ নিতেন তিনি।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আমাদেরকে এমন কিছু বিষয় জানিয়েছেন, যা জানানো তাঁর পক্ষেই শুধু সম্ভব ছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একান্ত আমল সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ আমি একদিন আমার খালাম্মার গৃহে ছিলাম। যখন সন্ধ্যা নেমে এলো, আঁধারে ছেয়ে গেলো চারিদিক,রাতের একটি অংশ ফুরিয়ে গেলো, আমিও ঘুম থেকে উঠলাম এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতই উযূ করলাম। যখন তিনি নামায পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন আমিও তার পিছনে নামাযে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি দীর্ঘক্ষণ নামায পড়লেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ এর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এমনকি আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাক ডাকার শব্দও শোনলাম। মুয়াজ্জিন এসে ডাকলে তিনি উযূ না করেই নামাযের জন্য বেরিয়ে গেলেন।

রাসূলের (সাঃ) দু'আ

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আমাদেরকে শুনিয়েছেন আরো একটি উপভোগ্য আর উপকারী ঘটনা, তিনি বলেনঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গভীর রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠলেন এবং পান পাত্রের কাছে গেলেন এবং উযু করলেন এরপর দাঁড়িয়ে উযূর অবশিষ্ট পানি পান করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে আমি মনে মনে ভাবলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন করেছেন আমিও তেমনি করবো। যেমনি ভাবনা তেমনি কাজ, উঠে পড়লাম আমি। উঠে উয্য করলাম এবং দাঁড়িয়ে উযূর অবশিষ্ট পানি পান করলাম, এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাড়িয়ে গেলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইশারা করলেন তার পাশে দাঁড়ানোর জন্য কিন্তু আমি তা করলাম না। নামায শেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেনঃ কেন তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়ালে না? আমি বললামঃ হে রাসূল! আপনি আমার কাছে এত মহান, আমি কিভাবে আপনার পাশে দাঁড়াবো!?

আব্দুল্লাহর উত্তর শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুগ্ধ হলেন, দুআ করলেন আব্দুল্লাহর জন্য। বললেনঃ হে আল্লাহ্

আপনি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ভেতরটা প্রজ্ঞার আলোয় ভরে দিন! তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন!

মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় ও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূলের কাছে ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ। আশৈশব ইবনে আব্বাসের প্রতি রাসূলের একটা সুদৃষ্টি সব সময়ই ছিল। তারুণ্যে পদার্পণ পর্যন্ত তার প্রতি রাসূলের এই সুনজর ছিল অব্যাহত।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেনঃ হে আল্লাহ আপনি ওকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করুন! তাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করুন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলেছেনঃ হে আল্লাহ আপনি ওকে জ্ঞান দিন এবং কুরআন ব্যাখ্যার ক্ষমতা দিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো বলেছেন ও হে আল্লাহ আপনি ওর মাঝে বরকত ঢেলে দিন, আর ওকে আপনার ভালো বান্দাদের সাথে মিশিয়ে নিন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ইবনে আব্বাসের জন্য শুধু দুআ করতেন তা নয় বরং তিনি ইবনে আব্বাসের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতেন। তার শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাকে উপদেশ ও নসীহত করার ব্যপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনভাবে খেয়াল রাখতেন যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়তের আলোকে ইলমে ওহীর নূরে দেখতে পেতেন ইবনে আব্বাসের জ্ঞান গরিমার সেই শীর্ষ আসন যেখানে অচীরেই তিনি গিয়ে পৌছবেন।

রাসূলের (সাঃ) শিক্ষা
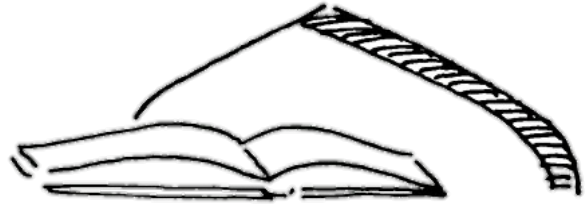
রাসূলের (সাঃ) শিক্ষা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাসকে ইসলামের প্রারম্ভিক বিষয়গুলো শিখিয়েছিলেন, শিখিয়েছিলেন ঈমানের মৌলিক কথাগুলো।

এক দিনের ঘটনা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ারীর পেছনে চড়ে যাচ্ছেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হে বালক! আমি কি তোমাকে এমন কিছু বাক্য শিখাবো, যেগুলো দ্বারা আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন!?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কথা বলতে চাইলেন সে কথা শোনার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠলেন হযরত ইবনে আব্বাস

(রাযিঃ)। পরম উৎসাহে ঝুঁকে পড়লেন রাসূলের দিকে। বললেনঃ হে রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কেন আমি আপনার মধুমাখা বাণী থেকে মাহরুম হবো? বঞ্চিত হবো?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি আল্লাহর হকগুলো পরিপূর্ণভাবে আদায় কর। তাহলে আল্লাহ্ তোমাকে হেফাজত করবেন।

তুমি আল্লাহর হকগুলো পরিপূর্ণ রূপে আদায় কর তাহলে তুমি আল্লাহ্কে তোমার সামনেই দেখতে পাবে।

তুমি সুখের সময়ে আল্লাহকে মনে রেখো! তাহলে দুঃখের সময়ে তিনি তোমাকে মনে রাখবেন।

যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহর কাছে চাইবে! আর যখন কোন বিষয়ে সহযোগিতা চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই সহযোগিতা চাইবে।

আর মনে রেখো! যদি সমগ্র মানবজাতি মিলে তোমার কোন উপকার করতে চায় তাহলে আল্লাহ্ যা লিখে রেখেছেন তাঁর অতিরিক্ত কোন উপকার তারা তোমার করতে পারবে না। আর যদি তারা সকলে মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে চায় তাহলে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন তার অতিরিক্ত কোন ক্ষতি তারা করতে পারবে । লিখার পর কলম উঠিয়ে ফেলা হয়েছে পৃষ্ঠাগুলোর কালি শুকিয়ে গেছে।

রাসূলের (সাঃ) আদর ও স্নেহ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাসকে মন উজাড় করা অফুরাণ আদর ও যত্ন দিয়ে লালন-পালন করতেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, এই নামটি রাসূলের মুখে হাসির ঝিলিক তুলতো। নামটি শোনলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দিত হতেন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাসূলকে কখনো কখনো এমন সব প্রশ্ন করতেন যেগুলো থেকে তার মেধা ও বুদ্ধিমত্তার তীক্ষ্ণতা ও প্রখরতা ঝরে পড়তো।

তার কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয় শান্ত হতো। তার সাথে কথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শান্তি পেতেন, কখনো তাঁকে আদরে জড়িয়ে ধরতেন নিজের বুকের সাথে।

আল্লাহতায়ালা শৈশবেই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দ্বারা একাধিক কারামাতের ঘটনা ঘটিয়েছেন। সে সবের মাঝে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম এর দর্শন লাভ হচ্ছে অন্যতম।

এবার তার নিজের মুখেই শোনা যাক জিবরাঈল আলাইহিস্ সালামকে দেখার কাহিনী। তিনি বলেনঃ একদিন আমার বাবার সাথে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসেছিলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আমার

বাবার দিকে মোটেই খেয়াল করলেন না। ফলে বাবা সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন, আমিও বাবার সাথে বেরিয়ে গেলাম। বাবা আমাকে বললেন ? দেখলেতো তোমার চাচাতো ভাইয়ের কাণ্ডটা। কিভাবে সে আমাকে উপেক্ষা করলো। অবহেলা করলো। মুখ ফিরিয়ে রাখলো অন্য দিকে।

তখন আমি বললামঃ বাবা! তিনিতো অন্য একজন লোকের সাথে বসে-বসে নিচু স্বরে কথা বলছিলেন। বাবা বললেন ও তাঁর কাছে কি কেউ ছিল? বাবার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর।।

আমি বললামঃ জী, ছিল!

বাবা আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে গেলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! এই মুহূর্তে আপনার কাছে কি কেউ ছিল ? আব্দুল্লাহ্ যে আমাকে বললোঃ আপনার কাছে নাকি একজন লোক ছিল, যার সাথে বসে বসে আপনি চুপি-চুপি কথা বলছিলেন!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আব্দুল্লাহ! তুমি কি তাঁকে দেখেছ?

আমি বললামঃ জী, দেখেছি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল।

আরেকবার হযরত আব্বাস (রাযিঃ) তার ছেলে আব্দুল্লাহকে কোন প্রয়োজনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে পৌঁছলেন তখন

দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একজন লোক বসে আছে। ঐ লোকটি থাকার কারণে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লারেম সাথে কথা বলতে পারলেন না। ফিরে এলেন তিনি, এসে হযরত আব্বাস (রাযিঃ) কে জানালেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে একজন লোক বসে আছেন, তাই রাসূলের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারিনি। রাসূলের সাথে কথা না বলেই ফিরে এসেছি।

রাসূলের সাথে যখন হযরত আব্বাস (রাযিঃ) এর সাক্ষাত হলো, তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো আপনার কাছে আব্দুল্লাহকে পাঠিয়েছিলাম সে আপনার কাছে একজন লোককে বসা দেখে ফিরে এসেছে। সে আপনার সাথে কোন কথাই বলতে পারেনি।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ চাচাজান আপনি কি জানেন ঐ লোকটি কে ছিল?

আব্বাস (রাযিঃ) বললেনঃ না তো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আর শুনুন! আপনার এই ছেলে দৃষ্টিহীন হওয়ার পুর্বে মৃত্যু বরণ করবেনা, আর আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাকে প্রচুর জ্ঞান দান করা হবে।

পরবর্তিকালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ভবিষ্যত্বাণীই সত্যে পরিণত হয়েছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) উম্মতের মাঝে ছিলেন এক মহাজ্ঞানী। আর দৃষ্টিশক্তি ফুরিয়ে যাওয়ার পরই তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

তরুণ প্রতিভা

তরুণ প্রতিভা

হযরত ইবনে আব্বাসের প্রতিভার পরিচয় মিলে ছেলেবেলাতেই। আর সেই বালকের মাঝে প্রতিভা জন্ম নেবে না কেন - যে পেয়েছে শ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদরমাখা সাহচর্যের বিরল মর্যাদা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান আর প্রজ্ঞার গভীর ঝর্ণাধারা থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে যে অসংখ্য মনি-মুক্তা। যার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদয় উজাড় করে দু'আ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা যেন তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।

কেন তার মাঝে প্রতিভার জন্ম হবে না! যার মুখে সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্রতম মুখের লালা প্রবেশ করেছে।

শৈশব কৈশোরের সিঁড়ি ভেঙ্গে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) যখন তারুন্যের আঙ্গিনায় পা রাখলেন তখন ইলমের এক নূরাণী ধারা যেন তার মাঝে এসে মিশে গেলো। ইলম ও প্রজ্ঞার এক বর্ণীল ঝর্ণায় তিনি অবগাহন করলেন।

তার এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের খোঁজ পেলেন হযরত উমর (রাযিঃ)। তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি।

তাই তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে নিয়ে প্রবীন সাহাবীদের মজলিসে প্রবেশ করতেন। নিজের মজলিসেও পাশে পাশে রাখতেন হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে। সফরে বের হলেও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে তার সাথে রাখতেন। এ বিষয়টি সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক মনে হলো।

প্রবীন সাহাবীদের এক মজলিসে হযরত উমর (রাযিঃ) এর সাথে হাজির হলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস। উপস্থিত প্রবীণ সাহাবীদের কেউ কেউ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের দিকে ইঙ্গিত করে বললেনঃ আমাদের ছেলের বয়সী এই বালকটি কেন আমাদের মজলিসে এসেছে?

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেনঃ তার জ্ঞান-গরিমা আর মান-মর্যাদার কথাতো আপনাদের অজানা থাকার কথা নয়!

এক দিনের একটি ঘটনা। হযরত উমর (রাযিঃ) সাহাবীদের মাঝে যারা বিজ্ঞ আলেম ও ফকীহ্ তাদের দাওয়াত করলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কেও তিনি তাদের মজলিসে ডেকে পাঠালেন। এই ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নিজেই বলেনঃ হযরত উমর (রাযিঃ) সেদিনের মজলিসে

আমাকে শুধু এজন্যই ডেকে ছিলেন যেন তিনি তাদের বুঝিয়ে দিতে পারেন, আমি যে কোন বিষয় বুঝি এবং তা বিশ্লেষণের ক্ষমতা রাখি।

তাই এবার হযরত উমর (রাযিঃ) উপস্থিত সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আচ্ছা, আপনারা আল্লাহর এই কালাম—

إذا جاءِ نصرالله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا

এর তাৎপর্য কি তা বলুনতো?

একজন সাহাবী বললেনঃ এর তাৎপর্য হচ্ছে, যখন আল্লাহ্ আমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং আমাদেরকে জয়ী করবেন তখন আমরা যেন আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হই এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। অন্যান্য সাহাবীরা নীরবে বসে রইলেন, কিছুই বললেন তারা।

এবার হযরত উমর (রাযিঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের দিকে তাকালেন। বললেনঃ হে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস! তুমিও কি তাই বল? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বললেন : আমি এমনটি বলবো না।

তাহলে তুমি কী বলতে চাও? হযরত উমর (রাযিঃ) এর জিজ্ঞাসা ।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বললেনঃ এই সূরায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। এবং বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান দেয়া হয়েছে।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেনঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস! খোদার কসম করে বলছি, এই সূরা সম্পর্কে তুমি যা বলেছ আমিও তাই জানি। এছাড়া অন্য কিছু আমার জানা নেই।

তবে এ কথা সত্য যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের বয়সের স্বল্পতা (বড় বড় প্রধান সাহাবীদের সামনে) তার কণ্ঠকে অবনমিত করে রাখতো।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাযিঃ) বয়সে নবীন আর ইলমের ময়দানে অভিজ্ঞ এই সিংহশাবককে হাত ধরে-ধরে টেনে নিয়ে যেতেন বড়দের মজলিসে।

একদিন হযরত উমর (রাযিঃ) সাহাবাদের এক মজলিসে বসলেন। সকলে মিলে লাইলাতুল কদর নিয়ে আলোচনা জুড়ে দিলেন। একজন সাহাবী বিষয়টির উপর আলোকপাত করলেন। নিজের মতামত তুলে ধরলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ও বসে ছিলেন মজলিসের এক কোনায়। প্রবীন সাহাবাদের উপস্থিতিতে কিছুই বলছেন না তিনি। একেবারে চুপচাপ বসে আছেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেনঃ কি হলো আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস? তুমি দেখছি একেবারে নিশ্রুপ বসে আছ, কিছুই বলছো না যে ? কথা বল! আর শোন! বয়সের সল্পতা যেন তোমাকে কিছুতেই কুণ্ঠিত না করে।

আলোচনা শুরু করলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। তিনি বললেনঃ হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ বেজোড় আর তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন, তাই তিনি দুনিয়ার দিনগুলোকে সাত দিনে আবর্তিত করছেন। আর সাতটি বস্তুর মাঝে

আমাদের রিযিক ধার্য করেছেন। আমাদের উপরে সাতটি আকাশ বানিয়েছেন। আমাদের পায়ের নিচে সাতটি যমীন তৈরী করেছেন। উম্মুল কুরআন- সুরায়ে ফাতেহার মধ্যে সাতটি আয়াত দিয়েছেন। আল্লাহ তার কিতাবে নিকট আত্মীয়দের মাঝে সাতজনকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছেন। সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈও সাতবার। কংকর নিক্ষেপ করতে হয় সাতটি। তাই আমি মনে করি রামাযান মাসের শেষ সাত দিনের মাঝে লাইলাতুল কদর রয়েছে।

হযরত উমর (রাযিঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) এই বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হলেন, বললেনঃ এই ছেলেটি ছাড়া কেউ আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত হয়নি।

শিক্ষার প্রতি অনুরাগ

শিক্ষার প্রতি অনুরাগ
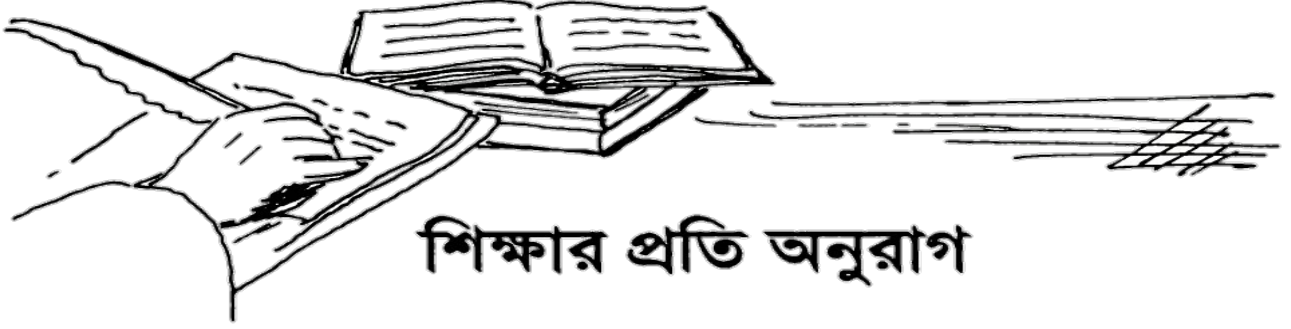
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শ্রেষ্ঠ বন্ধুর ডাকে সাড়া দিলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন পরপাড়ে। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) জ্ঞানের ভাণ্ডার এখনো পূর্ণ হয়নি। তার জ্ঞানের বৃক্ষ এখনও নিজের কাণ্ডের উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুতে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) খুব দুঃখ পেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারিয়ে তিনি কাঁদলেন, দু'চোখের তপ্ত আঁসুতে তার বুক ভেসে গেলো। কিন্তু কেদে আর কি হবে ? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তো আর পাওয়া যাবে না। তাহলে কি হবে ইবনে আব্বাসের ? সে যে ইলমকে ভালোবেসে ফেলেছে। ইলমের প্রতি সে অনুরক্ত হয়ে পড়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে ইলম আহরণ করে করে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এখন সে কোন পথ ধরবে ? সে কি ইলম আহরণের পথ ছেড়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে ? নাকি নবউদ্যমে শুরু করবে ইলম ও প্রজ্ঞা সঞ্চয়ের পুরাতন পথে নতুন যাত্রা পূর্ণ করতে তার পথচলা ? কী করবে সে ?

যেদিন থেকে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ইলম এবং উলামাদের মান-মর্যাদা বুঝতে শিখলেন, সেদিন থেকেই তিনি আবার সেই পুরাতন পথে চলতে লাগলেন, যে পথ তিনি আশৈশব নিজের জন্য বেছে নিয়েছিলেন। ইলম আহরণের সেই সুউচ্চ রাজপথ।

প্রবীন সাহাবীদের কাছ থেকে যা কিছু শিখেন তা হারিয়ে যাওয়ার ভয় তাকে তাড়া করে ফিরছিলো। তাই তিনি সে সব ইলমকে লিখনীর বন্ধনে বন্দী করে রাখতে চাইলেন। এজন্য তাকে লিখা শিখতে হবে। তাই তিনি লিখতে এবং পড়তে শিখলেন সর্ব প্রথম। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল হলো, তখন আমি একজন আনসারীকে বললাম, চলো আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের কাছ থেকে ইলম শিক্ষা করি । এখন তো তাঁদের সংখ্যা অনেক। এক সময় তাদের সংখ্যা নির্ঘাত কমে যাবে। লোকটি এমন আশ্চর্য হলো, চোখ কপালে তুলে বললোঃ হায় আশ্চর্য! ইবনে আব্বাস! খোদার কসম করে বলি, তুমি কি মনে কর, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এত সাহাবী জীবিত থাকতে লোকজন ইলমের প্রয়োজনে তোমার কাছে ছুটে আসবে?

একথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) লোকটির আশা ছেড়ে দিলেন। লেগে গেলেন ইলমের গবেষনায়। ইলমের অনুসন্ধানে সাহাবাদের পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগলেন। যদি ইলমের একটি টুকরো পেয়ে যান তবে সাথে সাথে কুড়িয়ে তুলে নেবেন নিজের থলিতে। নিজের জ্ঞানের সংগ্রহকে করবেন আরো সমৃদ্ধ, আরও পূর্ণ, এই আশায়।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ আমি যখন শোনতাম, লোকটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছেন, তখন আমি সাথে সাথে দৌঁড়ে যেতাম তার কাছে। গিয়ে দেখতাম তিনি শুয়ে আছেন। আমি তখন তার ঘরের দরজার সামনে আমার চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়তাম। মরুর লু-হাওয়া তপ্ত বালুকনাগুলোকে উড়িয়ে এনে আমার উপর ফেলতো। লোকটি জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত মরুর লু-হাওয়া আমাকে নিয়ে এভাবেই খেলা করতো। লোকটি যখন। জাগ্রত হয়ে আমাকে দেখতেন, তখন বলতেনঃ হে রাসূলের। চাচাতো ভাই! কি হয়েছে তোমার ? এভাবে পড়ে আছ কেন ? আমি বলতাম ও শুনেছি আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে একটি হাদীস শুনেছেন। তাই হাদীসটি আপনার কাছ থেকে শুনতে এসেছি।

লোকটি বলতেনঃ তুমি যদি আমাকে ডেকে পাঠাতে, তাহলে আমিই তো তোমার নিকট যেতাম। তখন আমি লোকটিকে বলতাম, আমিই আপনার কাছে আসার অধীক উপযুক্ত। আসলে তিনি আমাকে সর্বক্ষণ রাসূলের দরবারে দেখতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার সম্পর্কটি জানতেন, তাই তার এই অভিব্যক্তি।

হযরত আব্দুলাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ইলমের অন্বেসায় কোনরূপ অহংকার করতেন না, দেমাগ দেখাতেন না, ছোট-বড়, আযাদ-গোলাম যার কাছে ইলমের একটি ফোটা, জ্ঞানের একটি কনার সন্ধান পেতেন, তার কাছ থেকে তাই চেয়ে নিতেন ভিখারীর মত।

হযরত আবু রাফে (রাযিঃ) ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন খাদেম। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাঁর কাছ থেকে অনেক বিষয়ে ইলম অর্জন করেছেন। হযরত আবু রাফে (রাযিঃ) -এর কাছে কিছু খাতা পত্র ছিল, যেগুলোতে তিনি রাসূলের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ লিখে রাখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলতেন, তাই তিনি লিখে রাখতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা করতেন তিনি তাও লিখে রাখতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের ইলম আহরণের তীব্র আকাংখা ও প্রবল প্রয়াস লক্ষ্য করে আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযিঃ) মুগ্ধ হোন। তিনি বলেনঃ আমরা যে সুযোগ পেয়েছি (দীর্ঘ সময় রাসূলের সাহচর্য) এই বালকটি যদি তা পেতো, তাহলে কোন বিষয়েই আমরা তার সমান হতে পারতাম না।

তিনি ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়

তিনি ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়

আকাশের গায়ে যখন সূর্য জেগে ওঠে তখন তার আলোতে আলোকিত হয়ে যায় সারা দুনিয়া। আঁধারেরা যায় পালিয়ে। উর্বর যমীনের বুকে যখন বৃষ্টিরা ঝরে ঝরে পড়ে, তখন মাটি থেকে উদ্ভিদ জন্মায়, সবুজে ঢেকে যায় বৃষ্টিস্নাত সেই যমীন।

কোন হৃদয় যখন ভরে ওঠে ইলমের মনি-মুক্তায় তখন স্বভাবতই সেই হৃদয় থেকে ঠিকরে পড়ে প্রজ্ঞা ও পরম সহিষ্ণুতার আবাবিলেরা। ঠিক তেমনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। তিনি ছিলেন বিনয়, ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক।

এমন কোন আচরণ তিনি কখনোই করতেন না, যা তার অধৈর্যের পরিচয় বহন করে। এমন কোন কথা তার মুখে উচ্চারিত হতো না, যা সহনশীলতা বিবর্জিত। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কথায় সর্বদা ঝরে পড়তো ধৈর্য ও সহনশীলতার আবেশ। আর এমন হওয়াটাই ছিল তার জন্য স্বাভাবিক, কারণ তিনি যে

লালিত-পালিত হয়েছেন দুনিয়ার সকল যুগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গৃহে।

হযরত ইবনে বুরাইদা বলেনঃ একদিন একজন লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কে গালমন্দ করলো। তিনি লোকটির আচরণে ব্যথা পেলেও ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। ঠাণ্ডা মাথায় লোকটিকে বললেনঃ দেখ! তুমি আমাকে যাচ্ছেতাই বললে, গালমন্দ করলে, অথচ তুমি হয়তো জাননা, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে বেশ কিছু বিশেষ সুন্দর চরিত্র দান করেছেন। তুমি কান খুলে শুনে রাখ! আমি যখন কুরআনের কোন আয়াত শিখি, তখন আমি আন্তরিকভাবে কামনা করতে থাকি, প্রতিটি মুসলমান যদি আমার মত এই বিষয়টি জানতো, তাহলে কতইনা ভালো হতো।

আমি যখন মুসলিম শাসকদের কথা শুনি যে, তারা ইনসাফের ভিত্তিতে দেশ শাসন করছেন, তখন আমি আনন্দে আপ্লুত হই, অথচ হয়তো কখনোই আমি তাদের কাছে বিচারপ্রার্থী হবো না।

আমি যখন শুনতে পাই যে কোন মুসলিম দেশে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয়েছে, তখন আমি উল্লাসে ফেটে পড়ি, অথচ সেই ভুখণ্ড থেকে কোন কিছুই আমার চাওয়ার নেই, পাওয়ার নেই। এই ছিল হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের চরিত্র।

তিনি গালমন্দের উত্তর দিতেন ধৈর্য ও সহনশীলতা দ্বারা , মুখতার জবাব দিতেন জ্ঞানের গভীর বাণী নিংড়িয়ে। মানুষের গোচরে আর অগোচরে তার এই একই নীতি অনড় থাকতো।

মাইমুন বিন মিহরাণ বলেনঃ আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ আমি কোন মুসলমান ভাইয়ের অসংলগ্ন আচরণকে তিন ভাবে মূল্যায়ন করি।।

(১) তিনি যদি আমার চেয়ে উচু পর্যায়ের হন তাহলে তাকে সম্মান করি।

(২) তিনি যদি আমার সমপর্যায়ের হন, তাহলে আমি তার প্রতি করুণা করি।

(৩) তিনি যদি আমার চেয়ে নীচু পর্যায়ের হন, তাহলে তাকে অবহেলা করি না, বরং তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করি। এ হচ্ছে আমার মানসিক চরিত্র। যিনি আমার এই চরিত্র পছন্দ করেন না তার জন্য খোদার দুনিয়া অনেক বিস্তৃত রয়েছে, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

জিহাদের ময়দানে

জিহাদের ময়দানে

ইলম আহরনের অদম্য নেশা আর অসামান্য পরহেযগারী হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কে খোদার পথে জিহাদ করার কথা ভুলিয়ে দেয়নি বরং এই দুটি বিষয় তাকে জিহাদের ময়দানে তলোয়ারের ঝনঝনাল্কারের মাঝে বাজপাখির খিতায় ঝাপিয়ে পড়তে উৎসাহ যুগিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা চীর স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

কোন যুদ্ধেই হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) পিছপা হননি। প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। আরব ভূখণ্ডের বাইরেও তিনি অসংখ্য যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন।

২৭ হিজরীতে তিনি ইবনে সাদ বিন্ আবী সিরাজের নেতৃত্বে মিসর অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তিনি তাবারিস্তানের যুদ্ধেও

অংশ গ্রহণ করেন। সেখানের অধিবাসীরা হযরত উমর (রাযিঃ) এর যুগে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার ফলে মুসলমানদের সাথে তাদের যুদ্ধ বেধে যায়। জঙ্গে জামালেও (উস্ত্রীর যুদ্ধ) তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ছিফফীনের যুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন। খারেজী সম্প্রদায়ের সাথেও তিনি যুদ্ধ করেন। খারেজী হচ্ছে ঐ সম্প্রদায় যারা হযরত আলী (রাযিঃ) এর সাথে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং দল ছেড়ে চলে যায়। তিনি খারেজীদের সাথে তর্কযুদ্ধেও অংশ গ্রহণ করেন।

ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়ার রাজত্বকালে সে সময়ের পরাশক্তি রোমের সাথে ৪৬ হিজরীতে মুসলমানদের যে যুদ্ধ সংগঠিত হয় সে যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন। সেই যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনী বীরদর্পে আক্রমণ করতে করতে কনষ্ট্যানটিনোপল শহর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই যুদ্ধে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) সাথে নেতৃস্থানীয় সাহাবীদের একটি দলও ছিল, যাদের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ্। ইবনে যুবাইরও ছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) শুধু তলোয়ারের জিহাদেই অংশ গ্রহণ করেননি বরং তিনি তলোয়ারের যুদ্ধকে বাকযুদ্ধের অলংকারে অলংকৃত করেছেন। আমীর উমারাদের যে কোন অন্যায় কাজকর্ম তার নজরে পড়লে সে ব্যাপারে তিনি তাদের সতর্ক করে দিতেন। খলীফাদের সামনে সত্যের বানী উচ্চারণ করে তিনি সবচেয়ে বড় জিহাদে অংশ গ্রহণ করতেন। কারণ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ জালেম বাদশার সামনে দাড়িয়ে সত্য কথাটি বলে দেওয়া হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিহাদ।

জনসাধারণকেও তিনি সকাজ করার জন্য উৎসাহ যোগাতেন, আর অন্যায় অনাচার করলে তাদেরকে খোদার আযাবের ভয়। দেখাতেন। যারা অযথা খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতো তাদেরকে তিনি বুঝাতেন, সমঝাতেন। উপদেশ দিতেন।

হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের (রাযিঃ) সাথে যখন হযরত হাসান ও হযরত হোসাইনের (রাযিঃ) বিরোধ চলছিল তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাদের মাঝে আপস মিমাংসা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

উমাইয়্যা শাসকদের সাথে যখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) এর বিরোধ সৃষ্টি হয় তখনও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাদের মাঝে মিমাংসার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এভাবে তিনি বহুমুখী জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। আল্লাহতায়ালা তাঁকে রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন।

যুহদ ও ইবাদত
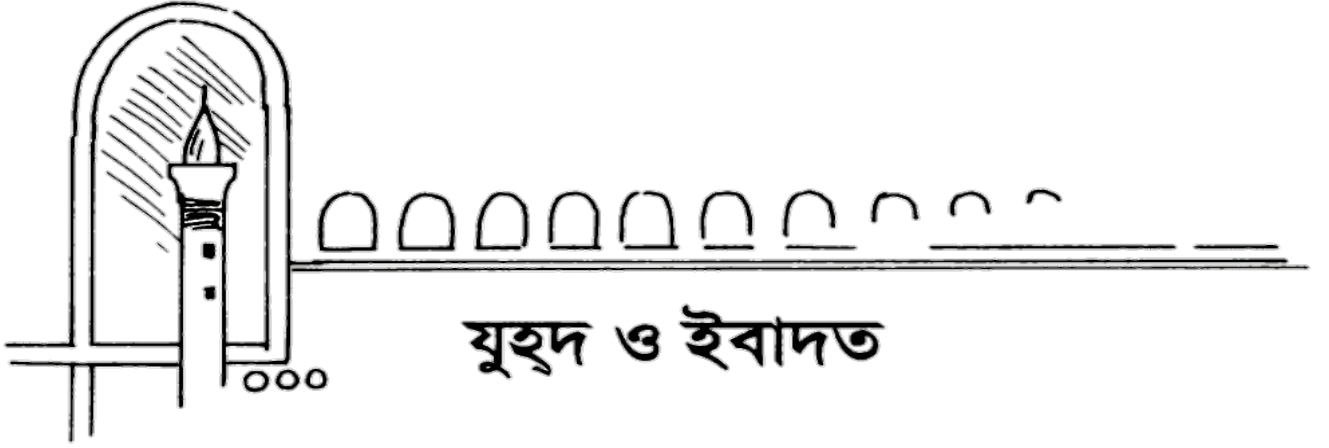
যুহ্দ ও ইবাদত

ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর দাসত্ব আর যুহদ হচ্ছে ত্যাগ- দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্যের মোহ ত্যাগ করা।

রাসূলের গৃহকোনই ছিল হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের প্রথম শিক্ষায়তন, যেখানে তিনি ইবাদত ও ত্যাগের যথার্থ শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তাই কালে তিনি যুহদ ও ইবাদতের মূর্তপ্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। যুহদ ও ইবাদতের দোলনায় যিনি লালিত-পালিত হয়েছেন, তিনিতো এমন হবেন এটাই স্বাভাবিক।

ইবনে মুলাইকার বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেনঃ একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) সাথে মক্কা থেকে মদীনায় সফর করলাম। পথে যে বিষয়টি আমি লক্ষ্য করেছি, তা হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) রাতের গভীরে জেগে

উঠতেন এবং দীর্ঘ সময় কুরআন শরীফ তেলাওয়াত ও যিকির-আযকারে কাটিয়ে দিতেন। তিনি রাতের বেলায় খুবই কম ঘুমাতেন।

ইবাদতের প্রশ্নে আর খোদার আনুগত্যের প্রশ্নে তিনি কখনো আপোস করতেন না। এ ব্যাপারে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতেও তিনি ছিলেন প্রস্তুত। এমনকি নিজের চোখ দুটি হলেও। হ্যাঁ এমনটিই ঘটেছিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের জীবনে। তিনি যখন বার্ধক্যে পা রাখলেন তখন তার নেত্রনালী শুকিয়ে গেল।

খোদার ভয়ে তিনি যে রাত-দিন কাঁদতেন, চোখের তপ্ত আঁস্ ঝরাতেন, এ জন্যই তার এ অবস্থা হয়েছিল। চোখের পানির স্রোত বইতে বইতে তার দুই গালের উপর দুটি কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। যেন জলপ্রপাতের ধারা।

তাবেঈ তাউস (রহঃ) বলেনঃ খোদার বিধানগুলোকে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের চেয়ে বেশী সম্মান করতে আমি কখনো কাউকে দেখিনি। খোদার কসম তার কথা যখন আমার মনে হয়, তখন আমি কান্নায় ভেঙ্গে পরি। আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারি না।

চিকিৎসকরা এলো হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) নেত্রনালীর চিকিৎসা করার জন্য। এসে বললোঃ আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমরা আপনার নেত্রনালীর চিকিৎসা করতে পারি। নেত্রনালী প্রবাহিত করে দিতে পারি। তবে শর্ত হচ্ছে আপনি পাঁচ দিন নামায পড়তে পারবেন না।

গর্জে উঠলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। বললেনঃ না! তা হবে না, খোদার কসম আমি একটি রাকাত নামাযও ছাড়তে রাজী নই। আমি রাসূলকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি

এক ওয়াক্ত নামায সেচ্ছায় ছেড়ে দিল সে ব্যক্তি যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন আল্লাহ্ তার উপর ক্রুদ্ধ থাকবেন। একথা বলে তিনি চোখের চিকিৎসা গ্রহণ থেকে বিরত রইলেন।

হযরত ইবনে আব্বাসের কাব্য-জ্ঞান
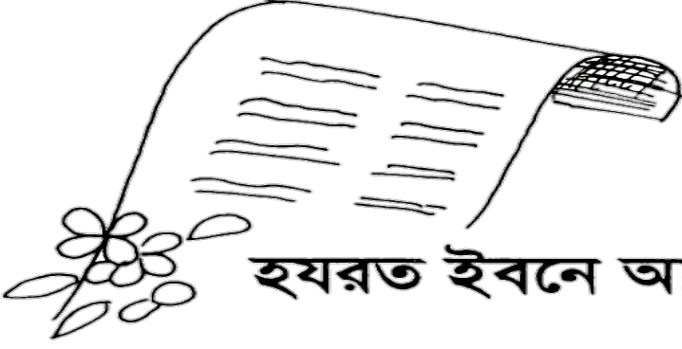
হযরত ইবনে আব্বাসের কাব্য-জ্ঞান

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কুরআন ও কুরআনের ইলমের গভীর জ্ঞানই শুধু রাখতেন না বরং তিনি আরবদের ভাষা ও তাদের ইতিহাস জানতেন, আরব্য কবিদের জীবন কর্ম ও কাব্য-কাসিদাগুলো ছিল তার নখদর্পনে। ছোট একটি ঘটনা থেকে তোমরা তার কাব্যজ্ঞানের পরিধি আন্দাজ করতে পারবে। একদিন বেশ কয়েকজন লোক জড় হয়ে কবি ও তাদের কবিতা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। খলীফা হযরত উমর (রাযিঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে হযরত উমর (রাযিঃ) একটি প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, তিনি বললেনঃ আরবদের মাঝে সবচেয়ে বড় কবি কে? এই প্রশ্ন শুনে উপস্থিত লোকেরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। কেউ কেউ বললেনঃ কবি সম্রাট ইমরুউল কায়স হচ্ছেন সবচেয়ে বড় কবি। আর কেউ কেউ বললেনঃ নাবেগাহ্ হচ্ছেন শ্রেষ্ট কবি।

ঠিক এমন সময় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) সেই মজলিসে এসে হাজির হলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) তাকে আসতে দেখেই বলে উঠলেন ? এই যে এসে গেছে কবি ও কবিতার বিষয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিটি। এর পর হযরত উমর (রাযিঃ) হযরত আব্দুল্লাহ্

ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কে লক্ষ্য করে বললেনঃ হে ইবনে আব্বাস! আরবদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কবি কে?

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বললেনঃ শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন যুহাইর ইবনে আবী সুলামা। এবার হযরত উমর (রাযিঃ) বললেনঃ তার কবিতার কিছু অংশ শোনাও দেখি!

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আবৃত্তি করলেনঃ

لوكان يقعد فوق الشمس من كرم

قوم باجسامهم أومجدهم قعدوا

قوم أبوهم سنان حين ينسبهم

طابوا وطاب من الاولاد ما ولدوا

মর্যাদারই শীর্ষ চুড়া যদি ছাড়ায় সৌরজগত

সূর্যপরি আসন তাদের স্বশরীরে সসম্মানে।

সবাই যখন ডাকবে তাদের সিনানেরই পূত্র বলে

সন্তানেরা সুখী তাদের তারাও সুখী আজীবনের।

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ

হে ইবনে আব্বাস! যুহাইরের সর্বনাশ হউক! সে যে বড় সুন্দর কথা বলেছে। যা রাসূলের গৃহের অধিবাসীদের ছাড়া অন্য সকলের জন্য বেমানান।
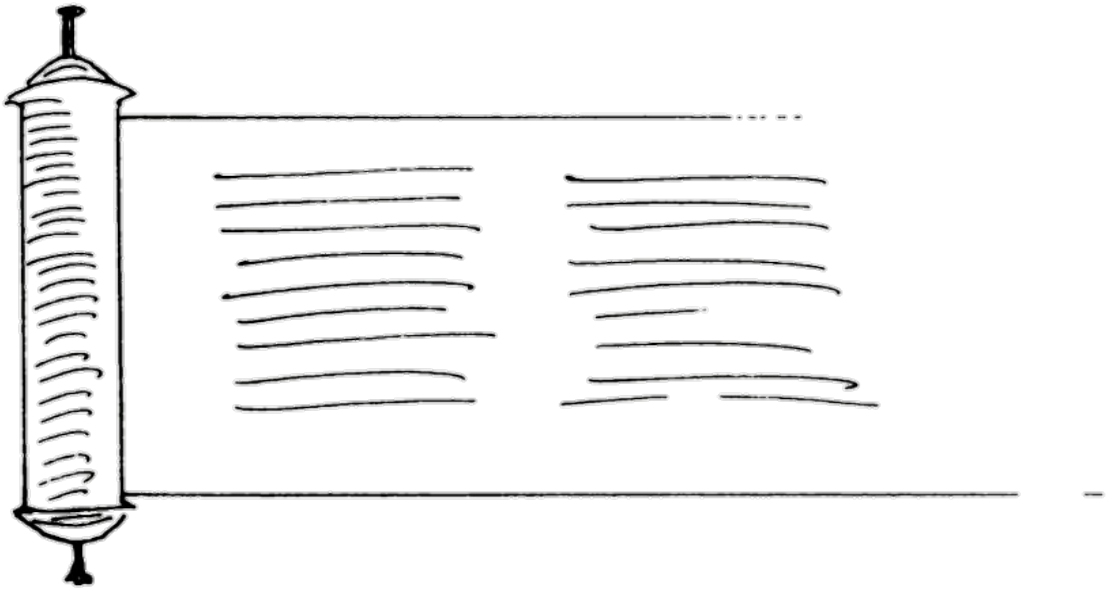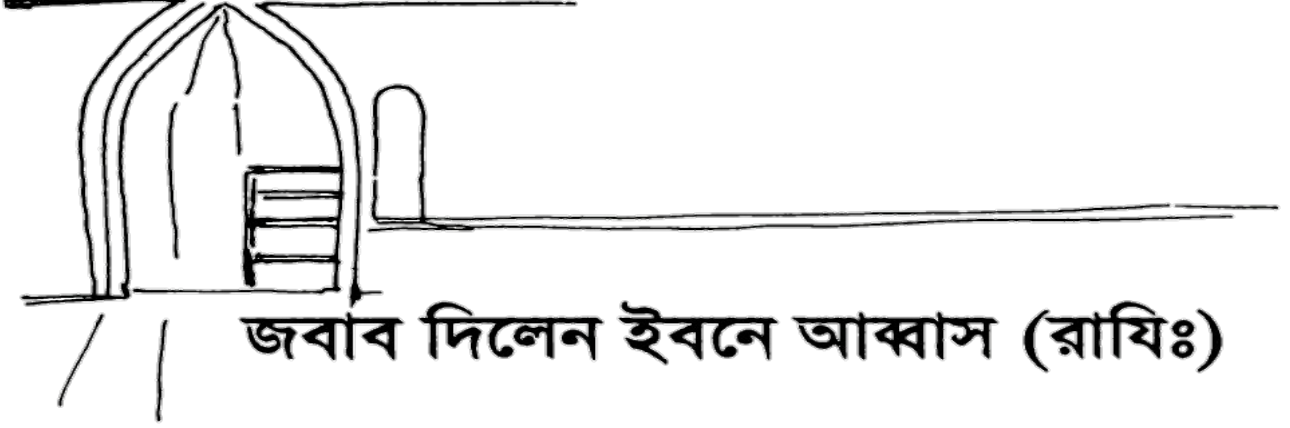
জবাব দিলেন ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)

জবাব দিলেন ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)

হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) এর দরবারে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তার ইলমের সম্মানে সম্মানিত হলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) তাকে নিজের ঘনিষ্টজনদের অন্তর্ভূক্ত করলেন। শুধু তাই নয় সকল জটিল ও কঠিন বিষয়ের সমাধান খুজেঁ বের করার জন্য তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে ডাকতেন। ফলে তিনি হযরত মুয়াবিয়ার (রাযিঃ) দরবারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

একবার রোমের সম্রাট হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) কে জব্দ করার মতলবে কয়েকটি জটিল প্রশ্ন লিখে পাঠালো। তার ধারণা ছিল মুসলমানরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুজে পাবে না, ফলে মুয়াবিয়া, দমে যাবেন। চুপসে যাবেন তিনি।

তাছাড়া মুসলমানদের জ্ঞানের গভীরতাটাও পরখ করে নেওয়া যাবে। কী সেই সব বিষয়? যেগুলো জানতে চেয়ে রোম সম্রাট পত্র লিখেছিলেন? তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, তবে শোন! রোম সম্রাট জানতে চাইলেনঃ

১. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কথা কোনটি ?

২. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা কে ?

৩. আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত বান্দি কোন নারী ?

৪. ঐ চারটি প্রাণী কী কী যেগুলো মায়ের উদরে অবস্থান করেনি?

৫. কোন স্থানে সূর্যের আলো শুধুমাত্র একবার পৌঁছেছে ?

৬. ঐ কবর কোনটি যা তার মধ্যস্থিত ব্যক্তিকে নিয়ে রীতিমত সফর করেছিল ?

৭. রংধনু ও সাত তারা কী? এবং সেগুলোর তাৎপর্যইবা কি?

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাযিঃ) পত্রটি হাতে পেয়ে মনযোগ সহকারে পড়লেন, তারপর এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখার জন্য জাতির সর্বাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কেননা এই লোকটি ছাড়া কে এমন আছে যিনি এই জটিল প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর খুঁজে বের করবেন।

পত্রটি পাঠ করে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) সাথে সাথে উত্তর লিখলেন। তিনি লিখলেনঃ

১. আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত বাক্য হচ্ছেঃ

سبحان الله والحمدلله ولااله الاالله والله اكبر ولاحول ولاقوة الابالله

২. আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত বান্দা হচ্ছেন হযরত আদম (আঃ)।

৩. আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে সম্মানিত বান্দী হচ্ছেন হযরত মারয়াম (আঃ) বিনতে ইমরান।

৪. আর যে চার জন মাতৃগর্ভে অবস্থান করেনি তারা হচ্ছেন (ক) হযরত আদম (আঃ) (খ) হযরত হাওয়া (আঃ) (গ) হযরত মূছা (আঃ) এর লাঠি যা খোদার কুদরতে সর্পে পরিনত হয়েছিল। (ঘ) হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ঐ দুম্বা যা আল্লাহ তায়ালা হযরত ইসমাঈল (আঃ) এর ফিদইয়া স্বরূপ পাঠিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ অবশ্য বলেছেন যে এ হচ্ছে হযরত সালেহ (আঃ) এর উটনী।

৫. আর যে স্থানে সুর্যের আলো শুধুমাত্র একবার পৌছেছে সেটা হচ্ছে লোহিত সাগরের তলদেশ। যখন খোদার কুদরতে হযরত মূসা (আঃ) এর জন্য সাগরের তলদেশ দিয়ে রাস্তা তৈরী হয়েছিল, আর পানি দুই দিকে সরে গিয়েছিল। আর বণীইসরাঈল পেরিয়ে গিয়েছিল লোহিত সাগর। ডুবে মরেছিল ফেরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা।

৬. আর যে কবর তার মধ্যস্ত ব্যক্তিকে নিয়ে সফর করেছে তা হচ্ছে হযরত ইউনুস (আঃ) এর ঐ মাছ যা তাকে গিলে ফেলেছিল এবং ৪০ দিন পর্যন্ত পেটে ধারণ করে সাগরের তলদেশে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

৭.(ক) আর রংধনু হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে যমীনের অধিবাসীদের জন্য অতিবৃষ্টি থেকে মুক্তির নিশ্চয়তা।

(খ) আর সাত তারা হচ্ছে আকাশের একটি দরজা।

এই উত্তরপত্রটি যখন রোম সম্রাটের হাতে গিয়ে পৌছলো, তখন সে পত্রটি পাঠ করে সাথে সাথে বলে উঠলো ও কিছুতেই এটা মুয়াবিয়ার উত্তর হতে পারে না বরং আমি নিশ্চিত যে এই কথাগুলো রাসূলের একান্ত ঘনিষ্ঠজনদের কারো হবে।

বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা
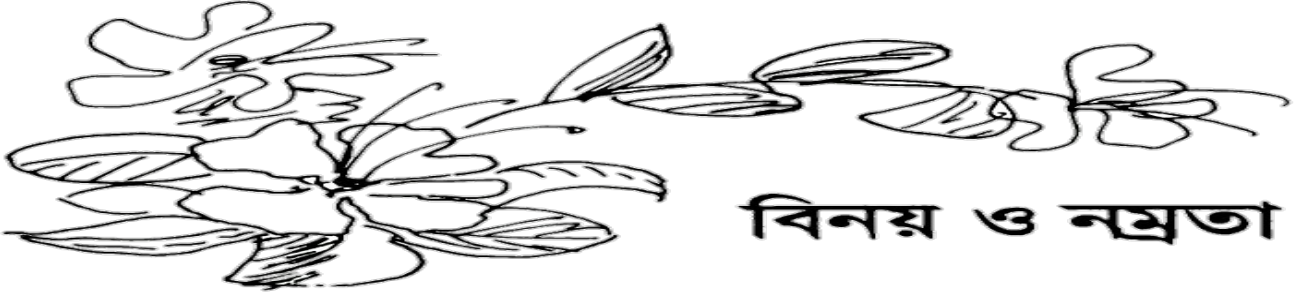
ইলম আহরণের পথে যিনি পথ চলেন, জ্ঞানীদের সাথে যিনি উঠা-বসা করেন, ইলম আহরণের আদব কায়দাগুলো তার রপ্ত হয়ে যায়। তিনি আলেম উলামাদেরকে সমীহ না করে পারেন না। তাদের সামনে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে পারেন না। তাদের সাহচর্য লাভ করে এবং তাঁদের উপদেশবাণী শুনে নিজেকে ধন্য মনে না করে পারেন না। পুলকিত না হয়ে পারেন না।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বংশ মর্যাদা ও ইলমের প্রাচুর্যে শোভিত ছিলেন তবুও তিনি আলেম উলামাদেরকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। বিনয়ে বিগলিত হতেন তাদের সাক্ষাতে। আলেম উলামাদেরকে কিভাবে সম্মান করতে হয় এবং তাদের সামনে কিভাবে বিনীত হতে হয় পরবর্তি প্রজন্মের জন্য আজও তার দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে তার আচরণগুলো।

হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) ছিলেন গভীর জ্ঞানের আধার। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তাঁর জ্ঞানের

গভীরতা টের পেয়েছিলেন। তাই তার জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে নিজের সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করার জন্য সব সময় তিনি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাযিঃ) এর পিছনে লেগে থাকতেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) যেই সওয়ারীর পিঠে চড়ে চলতেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) সেই সওয়ারীর লাগাম ধরে টেনে টেনে নিয়ে যেতেন। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) একদিন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) কে এমন করতে বারণ করলেন। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এতে দমলেন না বরং বললেন ? আমরা আমাদের উলামাদের সাথে এমন আচরণ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হলেন এবং বললেনঃ তোমার হাতটা আমার সামনে মেলে ধর! হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) নিজের হাত মেলে ধরলেন, হযরত যায়েদের (রাযিঃ) সামনে। হযরত যায়েদ (রাযিঃ) তার হাত ধরে চুমু খেলেন এবং বললেনঃ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের সদস্যদের সাথে এমন আচরণ করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের (রাযিঃ) বাড়ীতে যেতেন আর বলতেন ও ইলমের কাছে। মানুষ আসে, ইলম কারো কাছে যায় না। পিপাষার্ত যেমন কুপের ধারে যায়। আর কুপ কারো কাছে যায় না। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের (রাযিঃ) একনিষ্ঠ শিষ্য, ভক্ত ও অনুরক্ত। হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতের মৃত্যুতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) প্রচন্ড দুঃখ পেলেন। তাঁর কবরের পাশে দাড়িয়ে তার জন্য দু'আ করছিলেন এবং তার কীর্তিমালা স্মরণ করছিলেন একে একে। আর বলছিলেনঃ ইলম যে

কিভাবে দুনিয়া থেকে তুলে নেওয়া হবে সে চিত্র যদি কেউ দেখতে চায় তাহলে সে এসে দেখে যাক যে, এভাবেই ইলম তুলে নেওয়া হয়। আলেমদের মৃত্যুর মাধ্যমেই ইলম তুলে নেওয়া হয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) মনে করতেন যে হযরত যায়েদ (রাযিঃ) ছিলেন "আর-রাসেনা ফিল ইলম" -এর অন্তর্ভূক্ত। "আর-রাসেনা ফি ইলম" বলতে বুঝায় দ্বীনী ইলমের বিষয়ে যারা বিদগ্ধ পণ্ডিত তাদেরকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল সাহাবীদের কাছে নিজের মনের গোপন কথাগুলো বলতেন, সে সকল সাহাবীরাও হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এই মতের সাথে একমত ছিলেন।
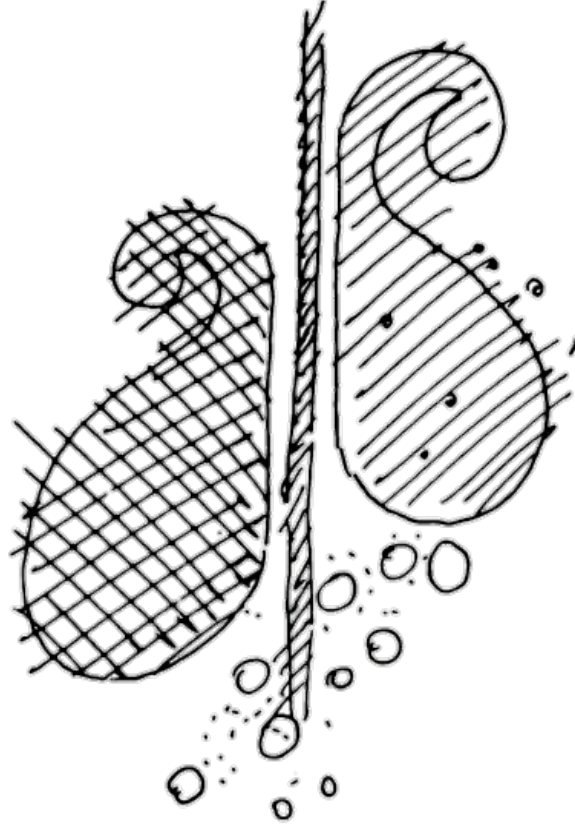
সাহাবা ও তাবেঈদের মুখে

সাহাবা ও তাবেঈদের মুখে
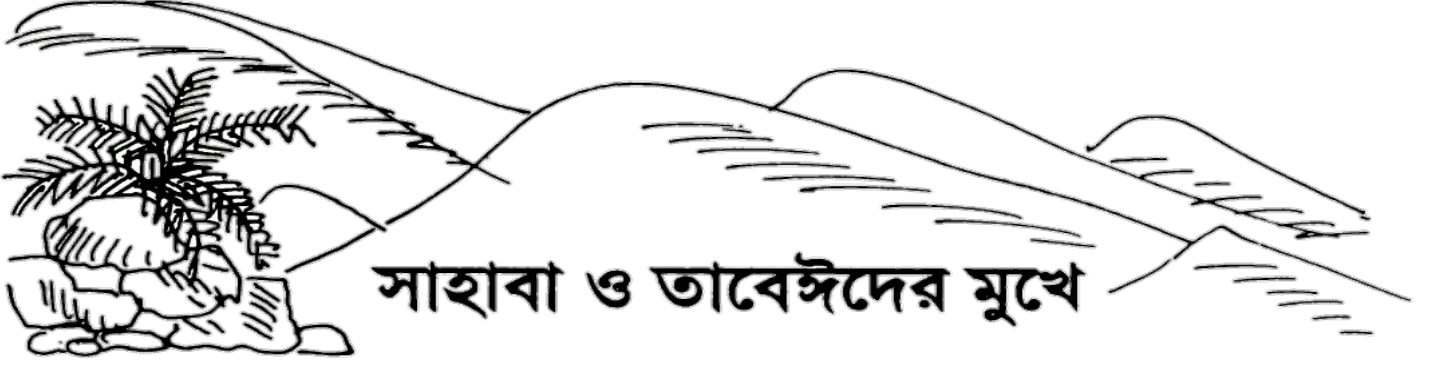
আল্লাহ্ তায়ালা হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)কে বিস্ময়কর প্রতিভা দান করেছিলেন। দিয়েছিলেন গভীরভাবে চিন্তা করার অদ্ভূত যোগ্যতা। তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আর অগাধ জ্ঞান।

তার সম্পর্কে বলা হয়ঃ মৌমাছি যেমন লোভনীয় ও সুস্বাদু মধু আহরণের জন্য ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ায়, ছুটে যায় এক উদ্যান থেকে অন্য উদ্যানে তেমনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)। ইলমের খোঁজে তিনি অবিরত ঘুরে বেড়াতেন এক আলেমের দরজা থেকে আরেক আলেমের দরজায়, ইলমের এক মজলিস থেকে অন্য মজলিসে।

সত্যই তিনি ছিলেন প্রশংসার উপযুক্ত একজন মানুষ। কারণ একাধারে তিনি ছিলেন ইলমের ইমাম, ইলমের এক মহাসাগর, দ্বীনী ইলমের এক মহাপন্ডিত, কুরআনের বিশ্লেষক ব্যক্তি।

আলোর পিছনে পতঙ্গ যেমন সদা ছুটে যায় ইলম ও মা'আরেফাতের পিছনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ছিলেন তেমনি সদা ধাবমান। তিনি ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণী। রাসূলের সকল প্রবীণ সাহাবী এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন, বড় বড় তাবেঈরাও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘনিষ্ঠ সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাযিঃ) বলেনঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মত উপস্থিত বুদ্ধি, প্রখর ধীশক্তি এবং তাঁর চেয়ে অধীক জ্ঞানের অধিকারী ও অধীক সহনশীল আমি আর কাউকে দেখিনি।

হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে উতাবা বলেন ও কয়েকটি বিষয়ে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস সকলের উর্দ্ধে ছিলেন। তিনি এতো বেশী ইলমের অধিকারী ছিলেন যে, সে পরিমাণ ইলম আর কারো কাছে ছিলনা। এমনকি ইলমে ফিকাহ্র যে সকল বিষয়ের দলীল খুঁজে পাওয়া যেতো না সে সব বিষয়ে তিনি যে সমাধান দিতেন সে সমাধান অন্য কেউ দিতে পারতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য, ধৈয্যশক্তি ও বংশমর্যাদায় হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) ছিলেন অন্য সবার চেয়ে আলাদা।

তিনি আরো বলেনঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস, হযরত উমর (রাযিঃ) ও হযরত উসমান (রাযিঃ) এর বিচারকার্য সম্পাদনের বিষয়গুলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের চেয়ে ভালো করে কেউ জানতো না।

বিগত দিনের ইতিহাস তিনি সবচেয়ে ভালো বলতে পারতেন। তার কাছে কোন জটিল বিষয়ের সমাধান চাওয়া হলে সবচেয়ে সঠিক উত্তরটি তিনিই দিতেন।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইবনে উতাবা বলেনঃ আমরা তার দরসে হাজির হতাম। তিনি যেদিন জিহাদ সম্পর্কিত হাদীসের আলোচনা শুরু করতেন সেদিনের পুরো সন্ধ্যাটাই এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে করতে কাটিয়ে দিতেন। আবার কোন সন্ধ্যায় শুধু বংশসূত্র বর্ণনা করতেন আবার কোন সন্ধ্যায় আলোচনা করতেন শুধু কবি ও কবিতা নিয়ে। কোন সন্ধ্যায় দুইটির কোনটিই আলোচিত হতো না।

আবু ওয়ায়েল বলেনঃ মাওসিম নামক স্থানে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আমাদের সামনে একটি বক্তৃতা দিলেন। তার বক্তব্যে তিনি সূরায়ে নূরের এক একটি আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন আর তাফসীর করছিলেন। আমি তার ঐ বক্তব্যে এতো বেশী মুগ্ধ হই যে, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে ? যদি এই বক্তব্য পারস্য আর তুর্কীর লোকেরা শুনতো তাহলে দল বেঁধে সবাই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতো।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মাসরুক (রহঃ) বলেনঃ আমি যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের দিকে তাকাতাম তখন আমার মুখ থেকে স্বতস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসততা ও সবচেয়ে সুন্দর মানুষটিকে দেখছি আমি। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন আমি বলতাম ও সবচেয়ে বিশুদ্ধভাষী মানুষটি কথা বলছেন। যখন তিনি কোন বিষয়ে আলোকপাত করতেন তখন আমি বলতামঃ সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিটি আলোচনা করছেন।

হযরত মাসরুক আরো বলেনঃ আমি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ তিনবার পাঠ করেছি। প্রতিটি আয়াত পাঠ করে আমি থেমেছি এবং তার কাছে জানতে চেয়েছি এই আয়াতটি কোন বিষয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং এর প্রেক্ষাপট কি ছিল? আর তিনি আমাকে তা বলে দিয়েছেন।

কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ বলেনঃ আমি কখনো হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের মজলিসে ইসলামের শিষ্টাচার বিরোধী কোন কাণ্ড ঘটতে দেখিনি।

হযরত তাউস বলেনঃ আমি প্রায় পাঁচশত সাহাবীর সাক্ষাত লাভে ধন্য হয়েছি। তাঁরা যদি কখনো কোন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষন করতেন, তাহলে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) মতামতের খোঁজ করতেন এবং সেই অনুপাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

আবু মুলাইকাহ্ বলেনঃ আমি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুজাহিদ (রহঃ)-কে দেখেছি, তার কাছে বেশ কিছু খাতা ছিল। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছে কুরআনের তাফসীর জিজ্ঞেস করতেন আর হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস কুরআনের তাফসীর বলে দিতেন, তারপর বলতেন ? লিখে রাখ! এভাবে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের কাছ থেকে সম্পূর্ণ কুরআনের তাফসীর জেনে নিয়েছিলেন।

উরওয়া ইবনে যুবাইর বলেনঃ আমি জ্ঞানের ভূবনে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) মত এমন মানুষটি দেখিনি।

সাঈদ ইবনুল মুছাইয়া বলেনঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হচ্ছেন লোকদের মাঝে সবচেয়ে বড় আলেম ব্যক্তি। হযরত

সাঈদ ইবনে যুবাইর (রাযিঃ) বলেনঃ যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) আমাকে হাদীস শোনাতেন, তখন আমার মনে চাইতো যে যদি তিনি অনুমতি দিতেন তাহলে আমি তার কপালে চুমু খেতাম।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেনঃ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের ইলমের প্রাচুর্যের ফলে তাকে ইলমের সমুদ্র বলা হতো।
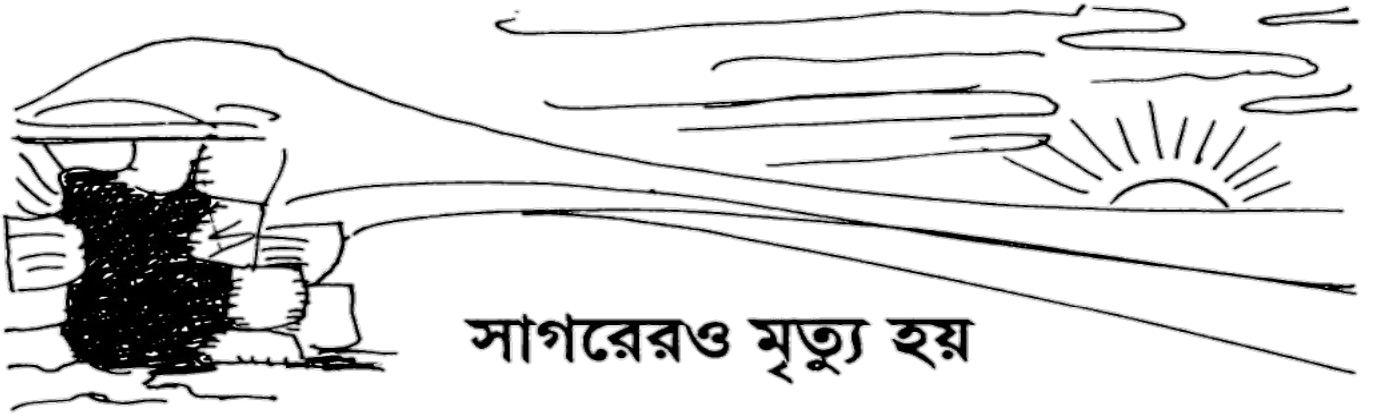
সাগরেরও মৃত্যু হয়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) যখন বার্ধক্যে পদার্পণ করলেন তখন তিনি ইসলামী খেলাফতের বিতর্কিত বিষয়গুলো এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তাই তিনি জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলো নীরবে নিভৃতে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য তায়েফ নগরীকে বেছে নিলেন। কারণ তায়েফ হচ্ছে নির্মল আবহাওয়া যুক্ত এক উর্দুভুমি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) তায়েফ যাওয়ার পর, ইলম পিয়াসী ছাত্ররা আশপাশের ও দূর-দূরান্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে আসতে থাকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ)ও অকাতরে বিলিয়ে দিতে থাকেন ইলমে ইলাহী ও ইলমে নববীর অমীয় সুধা। ইলমের আঙ্গিনায় ইলমের বুলবুলিদের মাঝে মধু

বিলাতে বিলাতে কবে যে ফুরিয়ে গেল হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এর জীবনের সত্ত্বরটি বসন্ত কে জানে ?

কুরআন আর হাদীসের পাতায় পাতায় হয়রান পেরেশান হয়ে এক সময় তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে গেল। তিনি একেবারে অন্ধ হয়ে গেলেন। রাসূলের সেই ভবিষ্যতবাণী হলো সত্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে তার বাবাকে বলেছিলেনঃ

“আপনার এই ছেলে দৃষ্টিহীন হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করবে না। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে প্রচুর জ্ঞান দান করা হবে। ”

এমনি একদিনে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের (রাযিঃ) ইন্তেকাল হলো, ইলমের এক মহাসাগরের মৃত্যু হলো।

মাইমুন ইবনে মিহরান বলেনঃ আমি তায়েফে আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের জানাযায় উপস্থিত ছিলাম। যখন জানাযার নামায আদায়ের জন্য তাঁর লাশ সামনে রাখা হলো, তখন কোত্থেকে যেন ধবধবে সাদা একটি পাখি উড়ে এসে তার কাফনের মাঝে হারিয়ে গেল। পাখিটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হলো, কিন্তু না, পাওয়া গেল না। অবশেষে জানাযার নামায পড়া হলো এবং যখন তাকে দাফন করা হলো এবং তার কবরের উপর মাটি বিছিয়ে

দেওয়া হলো তখন অদৃশ্য থেকে আমরা একটি আওয়াজ শুনছিলাম, কিন্তু ঐ আওয়াজ যার- তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু শোনা যাচ্ছিলঃ

يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي

অর্থ : হে প্রশান্ত প্রাণ! তুমি তোমার পালনকর্তার কাছে ফিরে যাও, সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতপর আমার বান্দাদের

অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

(সুরা আল ফজর-২৭-৩০)

।।।সমাপ্ত।।।

মাকতাবাতুল আশরাফ -এর

শিশু-কিশোর উপযোগী

কয়েকটি বই

নীল দরিয়ার নামে

(গল্প সংকলন)

শহীদানের গল্প শোন

(সিরিজ ১-১০)

আলোর ফোয়ারা

(আরবী শিশু সাহিত্য অবলম্বনে রচীত)

কিশোর সাহাবা

(সিরিজ ১-১০)

Ebook Created by: ইসলামিক ইপাব ও মোবি ক্রিয়েটর টিম (fb group)

শিশু-কিশোর উপযোগী কয়েকটি বই

নীল দরিয়ার নামে
(গল্প সংকলন)

শহীদানের গল্প শোন
(সিরিজ ঃ ১-১০)

আলোর ফোয়ারা
(আরবী শিশু সাহিত্য অবলম্বনে রচিত)

কিশোর সাহাবী
(সিরিজ ঃ ১-১০)

MAKTABATUL-ASHRAF

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪